বিনিয়োগকারীদের এ আস্থা ধরে রাখতে হবে

নতুন অর্থবছরের প্রথম কার্যদিবসেই শেয়ার বাজারে লেনদেনের অংক এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করে গেছে। ঢাকা স্টক এক্সেচেঞ্জে এ দিন ২৩৪টি কোম্পানীর ১ হাজার ১৪৯ কোটি ৭১ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। একই দিন চট্টগ্রাম স্টক এক্সেচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ১৬৩ কোটি ৩ লাখ টাকার শেয়ার। শেয়ার বাজারে লেনদেনের এই রেকর্ড ও উর্ধ্বমুখী প্রবণতা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। এটা কেবল শেয়ার বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের গভীর আগ্রহেরই প্রমাণ বহন করে না, একই সঙ্গে সরকারের প্রতি তাদের অকৃত্রিম আস্থারও পরিচয় বহন করে। দিন বদলের প্রত্যয় নিয়ে সরকার যে বাজেট দিয়েছে, একদিনে সব শেয়ারের মূল্য সূচক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তার প্রতি একটা সমর্থনও ঘোষিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাজেট বক্তৃতা জনমনে ব্যাপক উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা ও আশার সঞ্চার করেছে। শেয়ার বাজারে চাঙ্গাভাবের পেছনে ওই বক্তৃতার অনিবার্য ভূমিকা রয়েছে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের দিক-নির্দেশক ও অনুপ্রেরণাদায়ী ভাষণে প্রায়শই সে সব দেশের শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠতে দেখা যায়। সাম্প্রতিক কালের নজির হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার ভাষণের পর সেখানকার শেয়ার বাজারে যে তেজীভাব দেখা দেয়, তার কথা উল্লেখ করা যায়। প্রধানমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার পর কার্যত সেটিই ঘটেছে। শেখ হাসিনা ও তার সরকারের প্রতি জনগণের প্রবল আস্থা ও বিশ্বাস আরো একবার শেয়ার বাজারে রেকর্ড লেনদেনের শুভ সূচনার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্য এক খবরে জানা গেছে, বিশ্বের ২৫ টি দেশ বাংলাদেশে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। গত অর্থ বছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারী এই ৮ মাসে এসব প্রস্তাব এসেছে। পরবর্তী কালেও বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। উল্লেখ করা যাতে পারে, অনির্বাচিত অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দেশী বিনিয়োগ মারাত্মক হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কোন দেশে কোন ধরনের সরকার ক্ষমতায় আছে, সে দেশে সুশাসন পরিস্থিতি কেমন, তার বিনিয়োগ নীতি কেমন, আইন-শৃংখলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কতটা অনুকূল ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখেই বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আগ্রহী হয় অথবা অনীহা দেখায়। এই বিষয়গুলোর নিরিখেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে উৎসাহ দেখায় নি। পক্ষান্তরে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই এই দৃশ্যপট আমূল বদলে গেছে। বিপুল গণআস্থা নিয়ে এ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একবারে শুরু থেকেই দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানিয়ে আসছেন বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের জন্য। ইতোমধ্যে তার আহ্বানে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ইতিবাচক সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে। সরকারের প্রতি ব্যাপকভিত্তিক আস্থাই যে এর মূল কারণ তা বলা বাহুল্য।

বিনিয়োগকারীদের এই আস্থা ধরে রাখতে হবে, লালন করতে হবে এবং আরও উদ্দীপ্ত করতে হবে। অর্থনীতিবিদরা একমত, বিশ্ব মন্দার কারণে বিদেশী বিনিয়োগে সর্বত্রই ভাটার টান পড়েছে। বাংলাদেশ যত বিদেশী বিনিয়োগ আশা করে, হয়তো তত বিনিয়োগ পাবে না। অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি তাকে আরও বেগবান করার জন্য ব্যাপক বিনিয়োগের বিকল্প নেই। মন্দার প্রভাব সফলভাবে মোকাবিলার জন্যও বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। উৎপাদন, রফতানী ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবন-মানের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে বিনিয়োগ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবীদার। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, বিনিয়োগের যেহেতু বিকল্প নেই এবং বিদেশী বিনিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনাও তুলনামূলকভাবে কম, সুতরাং দেশী বিনিয়োগের প্রতি নজর দিতে হবে। যে কোনো মূল্যে দেশী বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সরকারও এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গেই দেখছে এবং দেশী বিনিয়োগ বাড়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের সঙ্গে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ শুধুমাত্র বিনিয়োগের স্বার্থেই দেয়া হয়েছে। দেশী বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত পুঁজি বা অর্থেরও প্রয়োজন। সেই অর্থের উৎস প্রধানত ব্যাংক এবং শেয়ার বাজার। ব্যাংকের যা অবস্থা তাতে তার পক্ষে বিনিয়োগ চাহিদা পুরোপুরি পূরণ খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে শেয়ার বাজার

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শেয়ার বাজার চাঙ্গা হওয়া এই প্রেক্ষাপটে তাই একটি বড় সুখবর।

শেয়ার বাজারে যারা বিনিয়োগ করে তাদের শতকরা ৯০ ভাগই সাধারণ ও স্বল্প আয়ের মানুষ। তারা বড় আশা, আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছে। তাদের আশা যাতে পূরণ হয়, তাদের আস্থা ও বিশ্বাস যাতে অটুট থাকে, তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। তারা তিল তিল করে অর্থসঞ্চয় করেছে এবং সেই অর্থ বিনিয়োগ করতে এসেছে। এ বিনিয়োগ যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং তারাও লাভবান হতে পারে, সেটা সর্বাধিক বিবেচনায় নিতে হবে। কোনো কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত বা হতাশ হলে পুঁজি সংগঠনের এই বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ব্যাহত হবে। ১৯৯৬ সালের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা এখনও অনেকের স্মৃতিতেই জাগরুক রয়েছে। সে সময় শেয়ার বাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ব্যাপক সংখ্যায় এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাদের পরিণতি হয়েছিল অত্যন্ত করুণ। তার জের এখনও অনেকে বহন করছে। এতদিন পর আবার ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার জন্য দলে দলে আসছে। ভীতি আছে, শংকা আছে; তারপরও তারা আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে আবার শেয়ার বাজারে ফিরে এসেছে। তাই সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে সেদিকে সরকারকে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। সাধারণ মানুষের অর্থ, আস্থা ও বিশ্বাস কেউ বা কোনো চক্র যেন লুণ্ঠন করতে না পারে, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। নজরদারী ও মনিটরিং সার্বক্ষণিক করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায়শই বলে থাকেন, আওয়ামী লীগ গরীবের দল, আওয়ামী লীগ গরীবের বন্ধু। এই ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরাও মূলত গরীব এবং দেখা যায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই তারা শেয়ার বাজারে ভিড় জমায়। সুতরাং তাদের বিনিয়োগের সার্বিক সুরক্ষা দিতে হবে। সরকারকে এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এটা দেখতে হবে। শেয়ার বাজার চাঙ্গা রাখতে হবে, জাতীয় স্বার্থেই। এখন যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা তার পেছনে কালো টাকার ভূমিকা থাকতে পারে। এই ভূমিকা হয়ত সামনে কমে যাবে। কিন্তু এই চাঙ্গাভাব অব্যাহত রাখতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ জাগিয়ে রাখতে হবে। নতুন নতুন কোম্পানীর শেয়ার বাজারে আনতে হবে। গ্রামীণফোন শেয়ার বাজারে আসছে, এটা সুখবর। এ ধরনের আরও কোম্পানী, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে শেয়ার বাজারমুখী করতে হবে। যত বেশী সুখ্যাতি কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাজারে আসবে, শেয়ার বাজার ততই চাঙ্গা হবে। একটি শক্তিশালী শেয়ার বাজার জাতীয় অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থেই অপরিহার্য।

বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে মৃত্যু

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গতকাল প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, বৃহস্পতিবার শুধু রাজধানীতেই বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে অন্ততঃ ৩ জনের মৃত্যু এবং আরো কয়েকজনের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর আগে বুধবারও রাজধানীতে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে একাধিক ব্যক্তির করুণ মৃত্যুর খবর ছাপা হয়। সারা দেশে এ ধরনের অপমৃত্যুর সব সংবাদ পত্রিকায় আসে না। তবে রাজধানীতে গত ২ দিনে অন্ততঃ ৫ জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আষাঢ়ের স্বাভাবিক বৃষ্টিতেই যদি রাজধানীর বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা এরূপ ভয়ঙ্কর মৃত্যুফাঁদ হয়ে উঠে, তাহলে আকস্মিক ঝড়-তুফান বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা কতটা প্রাণঘাতী হয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। রাজধানীসহ সারা দেশে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে মৃত্যুর ঘটনা কোন নতুন সংবাদ নয়। তবে শুধু রাজধানীতে দুই দিনে একাধিক স্থানে ৫ জনের মৃত্যুর ঘটনাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এসব দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর দায় এড়াতে পারে না।

বুধবার রাজধানীর নাজিমুদ্দিন রোডে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা ও ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার নিজ সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফিরতে গিয়ে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে মগবাজারে ৮ বছর বয়সী আরেক স্কুলছাত্রের মায়ের করুণ মৃত্যুর ঘটনা জাতির বিবেককে নাড়া দিলেও বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের তত্ত্বাবধান ও ডেসা'র কর্মকাণ্ডে আদৌ কোন পরিবর্তন আসবে কি? যত দিন যাচ্ছে, বিদ্যুতের তারগুলো যেমন জীর্ণ হচ্ছে,

তেমনি বিদ্যুতের খুঁটি ও সঞ্চালন লাইনগুলো যেন ক্রমবর্ধমান নানাবিধ তারের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়ছে। কোথাও কোথাও রাস্তার উপর ওভারহেড ওয়্যারিংয়ের অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হতে হয়। বিদ্যুৎ, টেলিফোন এবং স্যাটেলাইট ক্যাবল অপারেটরদের তারগুলো পথচারীদের মাথার উপর বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকার পুরনো দৃশ্য থেকে নগরবাসী মুক্তি চায়। লাইনের লোড ক্যাপাসিটি বিবেচনা না করা এবং তারের সংযোগসহ সঞ্চালন লাইন নিয়মিত তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণ না করায় এসব দুর্ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। বিদ্যুৎ ঘাটতিজনিত লোডশেডিংয়ের ফলে সৃষ্ট জনদুর্ভোগ মানুষ বাধ্য হয়ে মেনে নিলেও ডেসাসহ সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বহীনতা ও গাফিলতির কারণে বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে জড়িয়ে নিরীহ পথচারীদের এমন মৃত্যু মেনে নেয়া যায় না।

বিদ্যুতের তারের স্পর্শে বছরে সারা দেশে কত লোক প্রাণ হারায় তার কোন পরিসংখ্যান আমাদের হাতে না থাকলেও মাত্র ২ দিনে শুধুমাত্র রাজধানীতে ৫ জনের মৃত্যুর ঘটনায় বিচলিত না হয়ে উপায় নেই। সভ্য দুনিয়ার কোথাও রাজধানী শহরে কোন দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি বা অব্যবস্থাপনায় এভাবে বছরের পর বছর মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারে না। সরকার রাজধানীর নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির নানাবিধ প্রতিশ্রুতি দেয়, ঢাকাকে 'তিলোত্তমা' নগরী হিসেবে গড়ে তোলার কথাও অনেক শোনা গেছে। বিদ্যুতের তারের ওভারহেড ওয়্যারিংয়ের বিপদের পাশাপাশি তা' শহরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুতের লাইনের সাথে অবৈধভাবে টেলিফোন ও ক্যাবল অপারেটরদের সংযোগ লাইনগুলো বন্ধ করে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে রাজধানী শহরের সৌন্দর্য রক্ষা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বিদ্যুতের আন্ডারগ্রাউন্ড সঞ্চালন লাইন তৈরীর উদ্যোগ নিতে হবে। তার আগে বর্তমান সঞ্চালন লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণকারীর পরিবারের ক্ষতি কোন মূল্যেই পোষানো সম্ভব নয়। যাদের দায়িত্বহীনতার কারণে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে এবং হতাহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। রাস্তায় বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে দুর্ভাগ্যজনক অপমৃত্যুর আর কোন পুনরাবৃত্তি কেউ দেখতে চায় না। বিষয়টির জরুরী সমাধান কাম্য।

দক্ষিণ তালপট্টি : এই উপেক্ষার অবসান ঘটাতে হবে

মুনশী আবদুল মান্নান

বাংলাদেশের মানচিত্রে দক্ষিণ তালপট্টি নেই। প্রশাসনিক মানচিত্রে নেই। বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত মানচিত্রে নেই। বিভিন্ন কোম্পানীর যেসব আন্তর্জাতিক মানচিত্র বাংলাদেশে বিক্রি হচ্ছে, সেগুলোতেও নেই। আন্তর্জাতিক মানচিত্রগুলোতে দক্ষিণ তালপট্টিকে নিউমুর দ্বীপ বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তা ভারতের অংশ বলে দেখানো হয়েছে।

দক্ষিণ তালপট্টি বাংলাদেশের অচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই তা প্রশাসনিক মানচিত্রে যেমন থাকবে তেমনি মিশনগুলোর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত মানচিত্রেও থাকবে। একইভাবে আন্তর্জাতিক মানচিত্রগুলাতেও থাকবে। প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের মানচিত্রে দক্ষিণ তালপট্টি নেই কেন? নেই কেন আন্তর্জাতিক মানচিত্রগুলোতে?

ভারতের দাবী দক্ষিণ তালপট্টি তার। ভারতের দেয়া দক্ষিণ তালপট্টির নাম নিউমুর দ্বীপ। ভারতের মানচিত্রে এ দ্বীপ ভারতের বলে দেখানো হয়েছে। ভারতের অনুরোধে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে এবং ব্রিটিশ নৌচার্ট ও মার্কিন এনজিএ চার্টে একে নিউমুর দ্বীপ বলে উল্লেখ করে ভারতের বলে প্রদর্শন করা হয়েছে।

যতদূর জানা যায়, ১৯৭০ সালের প্রলংয়কর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে সীমান্ত নদী হাঁড়িয়াভাঙ্গার পতিত মুখ থেকে দু'কিলোমিটারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে দ্বীপটি জেগে ওঠে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে

বাংলাদেশের মৎস্যজীবীরা দ্বীপটির সন্ধান পায় এবং তারাই এর নাম দেয় দক্ষিণ তালপট্টি। ওই বছরের মাঝামাঝি সময়ে দ্বীপটি ভারত সরকারের নজরে আসে। অতঃপর কোন বাছ-বিচার ছাড়াই দ্বীপটি ভারতের বলে দাবী করা হয় এবং এর নাম দেয়া হয় নিউমুর দ্বীপ। ওই সময় মুক্তিযুদ্ধ চলছিল বলে বাংলাদেশের পক্ষে দ্বীপের মালিকানা সরকারীভাবে দাবী করা সম্ভব হয়নি। যতদূর জানা যায়, ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে এ নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয় যখন তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ঢাকা আসেন। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং যৌথ জরিপের প্রস্তাব করেন। ওই সময় দু'দেশের মধ্যে এই মর্মে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, দ্বীপের মালিকানা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং তা হবে যৌথ জরিপ শেষে। পরে ভারত এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে যায় এবং ১৯৮১ সালে দ্বীপ দখলে নৌবাহিনী প্রেরণ করে। তার আগে ভারতীয় পার্লামেন্টে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও ঘোষণা করেন, দ্বীপটি ভারতের। কাজেই যৌথ জরিপের প্রশ্ন ওঠে না।

তাহলে কি বাংলাদেশ দক্ষিণ তালপট্টির দাবী প্রত্যাহার করেছে এবং ভারতের দাবী স্বীকার করে নিয়েছে? না, এমন কোন ঘোষণা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বরং বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ দক্ষিণ তালপট্টির দাবী পুনর্ব্যক্ত করেছে। তবে এই দাবী যতটা জোরালো হওয়া উচিত ছিল ততটা জোরালো হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য যেসব কাজ করা দরকার ছিল, দুঃজনকভাবে বাংলাদেশ তা করতে সমর্থ হয়নি। প্রথমত, ভারতের সঙ্গে যে কোন দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় দক্ষিণ তালপট্টির বিষয়ে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া দরকার ছিল এবং এ সম্পর্কে দেশের জনগণকে সময়ে সময়ে অবহিত করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ও প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের দাবীর কথাটি তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল। এ নিয়ে আলাদাভাবে কোন কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হয়নি।

পক্ষান্তরে, ভারত জাতীয়ভাবে যেমন তেমন আন্তর্জাতিকভাবেও দক্ষিণ তালপট্টির মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য কোন প্রয়াসই বাদ রাখেনি। ভারত ইতোমধ্যে বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছে। সমুদ্রকে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করেছে এবং বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার অভ্যন্তরে টেনে এনেছে তার ব্লক। এর একটি ব্লকে দক্ষিণ তালপট্টিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় মানচিত্রে যেমন দক্ষিণ তালপট্টি ভারতের বলে প্রদর্শন করা হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক মানচিত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মানচিত্র ও চার্টে তার দাবীর প্রতিফলন ঘটানোর ব্যবস্থা করেছে। সর্বশেষে ভারত তার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত জাতিসংঘে জমা দিয়েছে। এই তথ্য-উপাত্তে দক্ষিণ তালপট্টির মালিকানা, সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রারম্ভিক পয়েন্ট এবং গভীর সমুদ্রে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন তুলে ধরা হয়েছে। যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের অধিকার, দাবী ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

ভারত তার জাতীয় স্বার্থে সম্ভাব্য সবকিছুই করেছে এবং করছে। বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বার্থে বলতে গেলে কিছুই করেনি এবং এখনও তার ভূমিকা ও অবস্থান দর্শকের মতো। ভাবটা যেন এরকম : দেখি ভারত কি করে! 'বাংলাদেশের মানচিত্রে তালপট্টি নেই' শিরোনামে পত্রিকান্তরে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। 'নেই কেন', এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে প্রতিবেদক পররাষ্ট্র সচিব এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের শীর্ষস্থানীয় তিনজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। বিষয়টি সরকারী পর্যায়ে যে কতটা বেআমল অবস্থায় আছে, তাদের কথাবার্তায় তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্রে তালপট্টির অবস্থান চিহ্নিত না করার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন, কেন হয়নি, তিনি তা জানেন না। অবশ্য তিনি বলেছেন, 'চিহ্নিত হওয়া উচিৎ'। আন্তর্জাতিক মানচিত্রে বাংলাদেশ অংশে দক্ষিণ তালপট্টিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে তিনি যা বলেছেন তাকে যে কেউ দায় এড়ানোর চেষ্টা বলে অভিহিত করতে পারেন। বলেছেন, 'এজন্য জরিপ অধিদফতরের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হবে। জরিপ অধিদফতর এটা করতে বললে আমরা আন্তর্জাতিক মানচিত্র যারা তৈরী ও বাজারজাত করে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করতে পারি।'

ভারত নিউমুর দ্বীপটি বিভিন্ন মানচিত্রে চিহ্নিত করে বিশ্বের সব মানুষের মধ্যে ধারণা তৈরী করে দিতে চাচ্ছে

যে, 'নিউমুর' দ্বীপটি ভারতের, বাংলাদেশের নয়– এ বিষয়ে তার অভিমত জানতে চাইলে পররাষ্ট্র সচিব যা বলেছেন তাতে মনে হয়, ভারত যা করছে তার যেন কোন মূল্য ও গুরুত্বই নেই। অন্যদিকে এ ব্যাপারে বাংলাদেশের যে কোন উদ্বেগ থাকতে পারে তার কোন প্রকাশ তার কথায় নেই। তিনি বলেছেন, 'ভারত যতই কৌশলের আশ্রয় নিক, তা চূড়ান্ত কাজে লাগাবে না। কারণ, আমরা একটা আপত্তি জাতিসংঘ দিয়ে রেখেছি।'

ভারত তাহলে এসব অকারণে করছে? জাতিসংঘে বাংলাদেশের আপত্তির কথা কি ভারতের জানা নেই? পররাষ্ট্র সচিবের আরেকটি অভিমত হল, সমুদ্রসীমা নির্ধারণ হলেই তালপট্টি দ্বীপের মালিকানার বিষয়টিও সমাধান হবে। যদি বলা হয়, তালপট্টির মালিকানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হলে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টিও অনেক সহজ হয়ে যাবে, তাহলে তার কি জবাব হবে? সঙ্গত কারণে আরও প্রশ্ন ওঠে, সমুদ্রসীমা নির্ধারণের দিকে চেয়েই কি তালপট্টির ওপর বাংলাদেশের মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উপেক্ষা করা হচ্ছে?

বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্রে দক্ষিণ তালপট্টি চিহ্নিত না হওয়ার বিষয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের ডিরেক্টর অব সার্ভে বলছেন, 'যেহেতু দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটির মালিকানার বিষয়ে এখন বিবাদ রয়েছে সেজন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিলে প্রশাসনিক মানচিত্রে আমরা তালপট্টি দ্বীপটি চিহ্নিত করতে পারি।'

প্রশ্ন হল, তালপট্টির মালিকানা বিবাদ কি ভারতের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অবহিত নয়? অবহিত নয় পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়? একই অধিদফতরের অতিরিক্ত সচিব বলেছেন আরেক কথা। তার ভাষায়, '১৯৪৭ সালের র‌্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত আমরা জরিপ চালাতে পারি ও সে অনুযায়ী মানচিত্র তৈরী করতে পারি। সেটা করা হয়নি বলেই সম্ভবত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি আমরা দাবী করলেও মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়নি।'

এ কথার জবাবে স্বভাবতই এ প্রশ্ন উঠতে পারে, জরিপ কেন করা হয়নি এবং এ দায়িত্ব তাহলে কার? সবার ওপরে টেক্কা দিয়েছেন অধিদফতরের মহাপরিচালক স্বয়ং। তিনি বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক মানচিত্রে দক্ষিণ তালপট্টিকে চিহ্নিত করার বিষয়টি পরের বিষয়। আগে ঠিক করতে হবে বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্রে দ্বীপটিকে আমরা চিহ্নিত করব কিনা। প্রশাসনিক মানচিত্র আমরাই তৈরী করে থাকি। সরকারের সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে এলে আমরা তা অবশ্যই করব।'

মানচিত্রে দক্ষিণ তালপট্টির সংযোজন নিয়ে পররাষ্ট্র সচিব এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের তিন শীর্ষ কর্মকর্তার যে অভিমত পাওয়া গেল তাতে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের আক্কেলগুড়ুম হওয়ার যোগাড়। কোন কর্তৃপক্ষ এ কাজটি করার প্রকৃত কর্তৃপক্ষ তা সুস্পষ্টভাবে জানা হল না। এই গোলক ধাঁধায় নাম পাওয়া গেল তিনটি মন্ত্রণালয়ের– পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও ভূমি । তবে কেউই দায়িত্ব নিতে চায়নি। যদি ধরে নেয়া হয়, এ কাজে তিন মন্ত্রণালয়েরই সুনির্দিষ্ট অংশীদারিত্ব আছে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে, কোন মন্ত্রণালয়ই যথাযথ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়নি এবং তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোন প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা নেই।

মন্ত্রণালয়গুলোর কাজই যেহেতু সরকারের কাজ সুতরাং মন্ত্রণালয়গুলো ঠিকমত কাজ না করলে তার দায় সরকারের ওপর গিয়েই বর্তায়। সরকার যারা চালান তাদের দায়িত্ব নীতি নির্ধারণ করা, কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়গুলোকে দিকনির্দেশনা দেয়া। শুধু তাই নয়, বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাও তাদের দায়িত্ব। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন উদ্যোগ নেয়ার গরজ দেখায়নি এবং অতীতের সরকারগুলো বিষয়টির প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দেয়নি।

এখন অবস্থা এমন যে, বাংলাদেশ দক্ষিণ তালপট্টিসহ বিশাল সমুদ্র এলাকা হারানোর ঝুঁকির মধ্যে পতিত হয়েছে। ২৮ বছর পর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অর্থাৎ ২০০৮ সালের ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দু'দেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধানত দক্ষিণ তালপট্টির মালিকানা ও সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রারম্ভিক পয়েন্ট এবং গভীর সমুদ্রে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ বিভিন্ন টেকনিক্যাল পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা হয়। জানা যায়, বৈঠকে হাঁড়িয়াভাঙ্গা নদীর প্রবাহ কোন দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তা নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। কারণ, এর ওপর দক্ষিণ তালপট্টির মালিকানা নির্ধারণের বিষয়টি সরাসরি

জড়িত। ভারতের পক্ষ থেকে পূর্বাপর বলা হচ্ছে, নদীর মূল স্রোত দক্ষিণ তালপট্টির পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সে কারণে দ্বীপটি ভারতের। জবাবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, স্রোতধারাটি হাঁড়িয়াভাঙ্গা, রায়মঙ্গল ও যমুনা নদীর মিলিত স্রোতধারা। হাঁড়িয়াভাঙ্গা সীমান্ত নদী। আর রায়মঙ্গল ও যমুনা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। এ ক্ষেত্রে তিন নদীর মিলিত স্রোতকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং দিলে দেখা যাবে, স্রোতধারাটি তালপট্টির পশ্চিম দিক দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ তালপট্টি বাংলাদেশেরই অচ্ছেদ্য অংশ। ভারত এই দাবী মানতে নারাজ। ফলে কথিত বৈঠকে এ নিয়ে ফয়সালায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। অন্যদিকে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রারম্ভিক পয়েন্ট নিয়েও দু'দেশ ভিন্নমত পোষণ করে। উত্তর-দক্ষিণ লাইন টেনে সমতার ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বাংলাদেশী প্রস্তাবে ভারত অসম্মতি জ্ঞাপন করে। বৈঠকটি সম্পূর্ণ নিষ্ফল বলে প্রতিভাত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সঙ্গে আর কোন আলোচনা না করেই ভারত তার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত জাতিসংঘে জমা দিয়েছে। এর আগে মায়ানমারও তার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত জমা দিয়েছে। দু' দেশই বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার একটা বিরাট এলাকা তাদের বলে দাবী করে আসছে। এর আগে মায়ানমার ও ভারত বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে তাদের নৌবাহিনীর ছত্রছায়ায় জরিপ জাহাজ পাঠায়। বাংলাদেশের প্রতিবাদ ও বাধায় তারা সমুদ্র এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা তাদের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করে যে তথ্য ও দালিলপত্র জাতিসংঘে জমা দিয়েছে, তাতে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত সমুদ্রসীমার বিরাট এলাকা হারানোর আশংকা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশও তার সমুদ্রসীমা নির্ধারণের কাজ অনেকদূর এগিয়ে এনেছে। বাংলাদেশকে ২০১১ সালের ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত জাতিসংঘে জমা দিতে হবে।

ইনকিলাবে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, বাংলাদেশ তার নিজস্ব পানিসীমা ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মানচিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক পয়েন্ট হিসাবে দক্ষিণ তালপট্টিকে নির্ধারণ করেছে। হাঁড়িয়াভাঙ্গার এই পয়েন্ট থেকেই সমুদ্রসীমার বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে যাওয়ার তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত ডকুমেন্ট তৈরী করছে। পারম্ভিক পয়েন্ট নির্ধারণ না করে এবং দক্ষিণ তালপট্টিকে সেই প্রারম্ভিক পয়েন্ট হিসেবে নির্ধারণ না করে বাংলাদেশের পক্ষে গভীর সমুদ্রে যাওয়া সম্ভব নয়।

এ থেকেই অনুধাবন করা যায়, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের নিরিখে দক্ষিণ তালপট্টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা কতটা অপরিহার্য। ভারতের জাতীয় স্বার্থের দিক থেকেও দ্বীপটির গুরুত্ব কম নয়। তবে বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ভারতের দাবীর অনুকূলে নয়। দক্ষিণ তালপট্টির একক ও নিরংকুশ মালিকানা বাংলাদেশের। কারণ এ দ্বীপ গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের নদীবাহিত পলি দিয়ে। এটি বাংলাদেশের ভূখণ্ডের সবচেয়ে নিকটবর্তী। এর গঠন-প্রকৃতি ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট অনুযায়ী এটি বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গেই যুক্ত হবে। গাঙ্গেয়, বদ্বীপ অঞ্চলে ভূমি বিস্তারের ধারা দক্ষিণপ্রসারী এবং দক্ষিণপ্রসারী ভূমি বাংলাদেশের ভাগে পড়তে বাধ্য। সর্বোপরি নদীর মধ্য স্রোত নীতি অনুযায়ী এ দ্বীপ বাংলাদেশের অংশেই পড়ে।

দক্ষিণ তালপট্টির ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এর মালিকানার সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের এক বিশাল অংশের ওপর সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত। এটি যার মালিকানায় পড়বে সেই হবে সুবিশাল সমুদ্র অঞ্চল ও সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের অধিকারী। দ্বীপটির ওপর বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত ও অবিসংবাদী অধিকার প্রতিষ্ঠার তাই বিকল্প নেই। এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চল কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার বেড়ে যাবে। বেড়ে যাবে সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল। বাংলাদেশের ভূখণ্ডও বেড়ে যাবে পর্যায়ক্রমে। এছাড়া ওই অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ খনিজসম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অতীতে যত উপেক্ষাই করা হোক, এখন তালপট্টির মালিকানার ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে। ভারতের সঙ্গে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে। বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের কাছে স্বভাবতই আশা করে, ভারত বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের নিরিখে দক্ষিণ তালপট্টির ওপর বাংলাদেশের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেবে। অনুরূপভাবে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ন্যায়ানুগত্যের পরিচয় দেবে। মায়ানমারের কাছ থেকেও আমরা একই ধরনের ভূমিকা প্রত্যাশা করি। যেহেতু

ভারত ও মায়ানমার ইতোমধ্যেই তাদের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত জাতিসংঘে জমা দিয়েছে এবং তাতে বাংলাদেশের দাবী ও অধিকার খর্ব হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান রয়েছে, কাজেই বাংলাদেশের তরফে জাতিসংঘে অবিলম্বে আপত্তিপত্র প্রেরণ করতে হবে। পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব সমুদ্রসীমা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করে তথ্য-উপাত্ত জাতিসংঘে জমা দিতে হবে। এ ব্যাপারে কূটনৈতিক যোগাযোগ ও তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ম্যানহোল বিড়ম্বনা

রাজধানী ঢাকার ব্যস্ততম সড়কগুলোর মধ্যে শাহবাগ-কাঁটাবনমুখী সড়কটি অন্যতম। ভোর না হতেই অজস্র গাড়ীর অবিরাম জটলা রাতঅবধি এতে লেগেই থাকে। সারিবদ্ধ ছুটে চলা গাড়ীগুলো কেউ কাউকে সাইড দেয় না, সে সুযোগও নেই– তবু চালক হর্ন বাড়িয়ে যাচ্ছে। যেন একে অপরকে বলতে চায়– তোর পিছে আমি/তোর চেয়ে দামী। রাত ৯টার পর এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে না হতেই আবার ধেয়ে আসে ট্রাকের বহর। চলে সারারাত-পরের দিন সকাল ৮টা পর্যন্ত। চলুক তাতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু বিপত্তি বাধে তখনই যখন উক্ত সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অগ্রণী ব্যাংক, জাতীয় জাদুঘর শাখা সংলগ্ন সড়কের উপরিভাগ থেকে কমপক্ষে অর্ধহাত নীচে দেবে যাওয়া ম্যানহোলের ঢাকনাটিতে দূরন্ত গতিতে ছুটে আসা কোনো ট্রাক সজোরে আছড়ে পড়ে সৃষ্টি করে গগণবিদারী শব্দ। চমকে উঠে ব্যাংক ভবনে বসবাসরত ঘুমন্ত কোয়ার্টারবাসী। প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটে ছাত্র-ছাত্রী, অসুস্থ ও বৃদ্ধজনের। এ ভোগান্তির শিকার আজিজ কো-অপারেটিভ এপার্টমেন্টের বাসিন্দাসহ পাশেই অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের রোগীরাও। উল্লেখ্য, ম্যানহোলের ঢাকনার চারদিকে কালো পিচের আবরণ থাকায় দূর থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। অসহ্য এ যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে ম্যানহোলের ঢাকনাটি রাস্তা বরাবর উঁচু করা একান্ত প্রয়োজন। আমি জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

লিয়াকত জোয়ার্দার

ভাস্কর নভেরা স্টাফ কোয়ার্টার

জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

ডাকাতিয়ায় দেখতে চাই সেই সুস্বাদু মিঠা পানির মাছ

চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ-শাহরাস্তি, কুমিল্লার লাকসাম-মনোহরগঞ্জ, নোয়াখালীর রামগঞ্জ-চাটখিল-এর কিছু অংশ ছিল ডাকাতিয়া নদীঘেরা মৎস্য ভাণ্ডার। কোন এক সময় দেশজুড়ে এ অঞ্চলের মাছের ছিল ব্যাপক খ্যাতি। বাইলা, চিংড়ি, কালিবাউস, বাইন, টেংরা, পুটি, বজুরী, পাবদা, চিতল, মেনী, কাচকি, বাতাসি, কাইকা, টাকি, শৈল, গজার, কৈ, আইর, রুই, কাতলা, মৃগেল, শিং, মাগুর, ভেটকি প্রভৃতি মিঠা পানির এসব মাছের এখনও রয়েছে যথেষ্ট চাহিদা। বর্তমানে এ ধরনের মাছ বাজারে তেমন একটা চোখে পড়ে না। যদিও মাঝে মধ্যে জেলেদের ধরতে দেখা যায় তার দামও অনেক বেশী। বাজারে আসার আগেই তা পথে-ঘাটে বেচা-কেনা হয়ে যায়। স্থানীয় বাজারগুলোতে কৃত্রিম ফিসারি উৎপাদিত মাছ ছাড়া আর কোন মাছের অস্তিত্ব নেই। মিঠা পানির মাছের বিচরণ ক্ষেত্রগুলো অপরিকল্পিতভাবে ভরাট করে, বাঁধ দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে মাছের খামার। যেখানে চাষ করা হচ্ছে বিদেশী জাতের মাছ। ফলে মিঠা পানির প্রায় সকল প্রজাতির মাছই বিলুপ্তির পথে। অতীতে একটা রেওয়াজ ছিল। এ অঞ্চলে বহু দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজনরা বেড়াতে আসতো শুধু ডাকাতিয়ার

চিংড়ি, বাইলা, বাইন মাছ খাওয়ার জন্য। অথচ এই মাছগুলোর এখন কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্ষা কালেও এই নদীতে এখন মাছের আকাল। পূর্বে ডাকাতিয়া নদী বর্ষা মৌসুমে সমস্ত পুকুর, ডোবা-নালা, নদীর সাথে সংযুক্ত ছিল। বর্তমানে পুরো এলাকায় কোন ডোবা বা নালা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুকুরপাড় উঁচু করে বেঁধে এখন কৃত্রিম জাতের সিলভার কার্প, গ্লাস কার্প, পাঙ্গাশ, তেলাপিয়া, অষ্ট্রেলিয়ান মাগুর প্রভৃতি মাছ চাষ করা হচ্ছে। অনেক স্থানে বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলা হচ্ছে ছোট ছোট মিঠা পানির মাছগুলো। কারণ মিঠা পানির এসব ছোট মাছের জন্য নাকি কৃত্রিম চাষকৃত মাছগুলো বড় হতে পারে না। অথচ কৃত্রিম এসব মাছ প্রাকৃতিক জলাশয় ও ডাকাতিয়া নদীর মাছের মত ততটা সুস্বাদু নয়। স্থানীয় এ প্রজাতির মাছগুলো বিপন্ন হওয়ার সাথে সাথে আমরা কৃত্রিম চাষাবাদের দিকেও ঝুঁকে পড়ছি। এ অঞ্চল যেমন মিঠা পানির মাছ ভরপুর ছিল, তেমনি ধানও জন্মাত প্রচুর। কিন্তু এখন জমিতে আগের মত ধানও হয় না। জমিতে অতিরিক্ত সার কীটনাশক প্রয়োগে যেমন জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি হচ্ছে তেমনিই উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে। কিছু দিন পরেই এ অঞ্চলে পানিতে ডুবে টুইটুম্বুর হয়ে যাবে। তখন আবার দেখা যাবে কারেন্ট জাল দিয়ে ধরা হচ্ছে ছোট মাছগুলো। এলাকাবাসী ও মৎস্য বিভাগ বিষয়টির প্রতি একটু নজর দিলে এই মিঠা পানির মাছ সংরক্ষণ সম্ভব। দেশী প্রজাতির মাছের জন্য নিরাপদ বিচরণ ক্ষেত্র বা অভয়াশ্রম গড়ে তোলা দরকার। হাজিগঞ্জ-শাহরাস্তির দক্ষিণে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বর্ষা মৌসুমে শুধু জলরাশি। তাই শুরু থেকেই ডাকাতিয়া নদীতে মিঠাপানির মাছের পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ যাতে কেউ ধরতে না পারে সে লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি এলাকাবাসীকে নিতে হবে কঠোর পদক্ষেপ। সেই সাথে মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে আলিগঞ্জ মাদ্রাসা মসজিদ সংলগ্ন নদী, কোতালিয়া খাল ও মালিগঞ্জ বাজার সংলগ্ন খালে দেশী জাতের রুই, কাতল, মৃগেল মাছের পোনা ছাড়া দরকার। পানি শুকাতে থাকলে চর এলাকায় ডোবা-নালায় এ সব মাছ আশ্রয় নেবে যা পরবর্তীতে পৌষ-মাঘ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত মাছের অভাব দূর করবে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ বিষয়টির প্রতি নজর দিলে একদিকে 'মাছে ভাতে বাঙ্গালী' প্রবাদটির সঠিক মূল্যায়ন হবে। অপরদিকে মিঠা পানির এই সুস্বাদু মাছগুলোও আমরা ফিরে পাব।

মোঃ মিজানুর রহমান

বড়কুল, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।